এইডস ৪
ডেঙ্গু জ্বর ৫
শিশুদের নিউমোনিয়া ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

CENTRE
FOR HEALTH AND
POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৯ সংখ্যা ১ শ্রাবণ ১৪০৭

কমিউনিটি ক্লিনিক

গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় একটি সংস্কার পরিকল্পনা

সুকুমার সরকার, হোসনে আরা বেগম
এস এম আসিব নাসিম, মোহাম্মদ মেসবাহউদ্দিন

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গণস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ক্রমশ জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতি জাতীয় উন্নয়নকে স্থায়ী করতে পারে। প্রায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংস্কার সাধিত হচ্ছে অথবা সংস্কারমূলক কর্মসূচি বিবেচনাধীন আছে। সাধারণত 'সংস্কার' বলতে বুঝায় এমন একটি পরিবর্তন—যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে আরো বৃহত্তর উন্নয়নের লক্ষ্য সাধিত হয়। প্রচলিত বা গতানুগতিক ধারায় যখন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন বিলম্বিত হয় বা প্রয়োজনের উপযোগী হয় না, তখনই সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দশকগুলোতে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। বিগত বছরগুলোতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সেবা-সরবরাহের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত অসামঞ্জস্য ও অসম্পূর্ণতা বিরাজ করছিলো। এ-অবস্থায় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় একটি ধারাবাহিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনকল্পে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (Health and Population Sector Programme) বা HPSP নামে ৫ বছর-মেয়াদী (১৯৯৮-২০০৩) একটি কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। HPSP-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারী, শিশু ও দরিদ্রদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণবিষয়ক অবস্থার উন্নতি করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি 'অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ'সহ নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবাসমূহকে গ্রহীতা-কেন্দ্রিক ও ব্যবহার-উপযোগী করে প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ তথা সেবাগ্রহীতার প্রকৃত চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সাশ্রয়ী, যথাযথ ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলাই "অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ" বা Essential Services Package (ESP)-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনিবার্য কারণবশত ৮ম বর্ষের চৈত্র সংখ্যা স্বাস্থ্য সংলাপ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত।

অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ প্রদানের স্তরসমূহ

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির আওতায় গ্রাম-এলাকায় তিনস্তরবিশিষ্ট সেবা-ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ প্রদান করা হবে। প্রতিস্তরে একটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এই সেবাসমূহ প্রদান করা হবে (ছক দেখুন)। এই চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ স্থায়ীভাবে অবস্থিত হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে সেবা-প্রদান পদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। উপজেলা-পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন-পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং গ্রাম-পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে এই অত্যাবশ্যক সেবাসমূহ প্রদান করা হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো হবে অত্যাবশ্যক সেবা প্রদানের প্রথম স্তর। প্রতিস্তরে নির্দিষ্ট সেবা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীগণ নিজেদের কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনমত জটিল সমস্যায় আক্রান্ত সেবাগ্রহীতাদের উচ্চতর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাবেন।

অত্যাবশ্যক সেবা প্রদানের বিভিন্ন স্তর

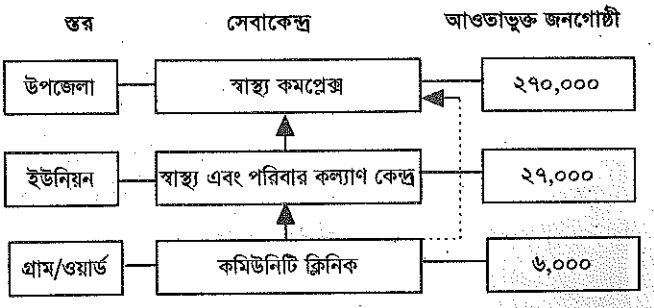

কমিউনিটি ক্লিনিক

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, একই স্থান থেকে সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে এমন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অধিকাংশ সেবাগ্রহীতার আগ্রহ রয়েছে। বর্তমান স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, সমন্বিতভাবে টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা প্রদান করার ফলে

একদিকে যেমন সেবা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে প্যাকেজ-সেবার জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইসিডিডিআর,বি'র অপারেশন্স রিসার্চ প্রজেক্ট-পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণায় দেখা গেছে, একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে উল্লিখিত সেবাসমূহের সাথে যদি আরো কিছু অত্যাবশ্যক সেবা একযোগে প্রদান করা যায়, তবে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে তা আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং সেবাগ্রহীতাদের দ্বারা সেই কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপট থেকে এবং আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ দেশব্যাপী অবস্থিত স্থায়ী কেন্দ্র থেকে প্রদান করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে এই অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ প্রদানের লক্ষ্যে নির্মিত স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর নামই 'কমিউনিটি ক্লিনিক'। এই ক্লিনিকগুলো গ্রাম/ওয়ার্ড-পর্যায়ে নির্মাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনগণের চাহিদা অনুসারে এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ সমন্বিত এবং একটি নির্দিষ্ট মান ও গুণসম্পন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক সেবা প্রদান করা হবে। গড়ে ৬,০০০ লোকের জন্য একটি করে সারাদেশে সর্বমোট প্রায় ১৮,০০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী এই কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে এলাকাবাসীকে যৌথভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক সেবা প্রদান করবেন। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রতিমাসে অন্তত একবার কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে তাঁর জন্য নির্ধারিত সেবাসমূহ প্রদান করবেন। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ডাক্তার/মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট মাসে অন্তত একবার কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে প্রয়োজনবোধে সেবা প্রদান ও মাঠ-কার্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন। সপ্তাহের সকল কর্মদিবসেই এই ক্লিনিক খোলা থাকবে এবং তা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম হবে না। এলাকাবাসীর প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লিনিকের সময়সূচি নির্ধারিত হবে। ক্লিনিকে কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী সপ্তাহে একদিন করে নির্দিষ্ট বাড়ি পরিদর্শন করে বিশেষ কিছু সেবা প্রদান করবেন। তবে দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর নির্মাণ সম্পন্ন এবং তা পুরোমাত্রায় চালু না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেবা প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু হওয়ার পরও পরীক্ষামূলকভাবে/সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত জনগণকে তাদের বাড়িতে গিয়ে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। কমিউনিটি ক্লিনিক পুরোপুরি চালু হওয়ার পর বিদ্যমান স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলো এবং অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধারণভাবে পরিবারের সবার জন্য এই কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা প্রদান করা হবে। তবে মা ও শিশুস্বাস্থ্যবিষয়ক সেবার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে যেসব সেবা দেওয়া হবে তার প্রধান প্রধান কয়েকটি সারণী ১-এ বর্ণিত হলো:

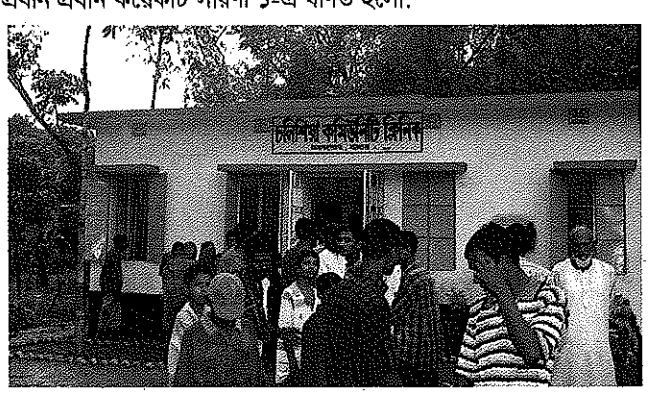

যশোর জেলার একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে রোগীর ভিড়

সারণী ১

কমিউনিটি ক্লিনিকে দেয় প্রধান প্রধান সেবাসমূহ

- মহিলাদের জন্য প্রসবপূর্ব, প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর এবং নবজাতকদের জন্য সাধারণ সেবা
- সময়মত শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের (যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, ধনুষ্টংকার ও হাম) প্রতিষেধক টিকাদান এবং ১৪-৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাদের টিটি টিকাদান
- আয়োডিনের স্বল্পতা, কৃমি, শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, ত্বকের ছত্রাক, ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসা কিংবা উচ্চতর হাসপাতাল/ক্লিনিকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে ঔষধ প্রদান
- ডায়রিয়া-আক্রান্ত রোগীদের খাবার স্যালাইনের সাহায্যে চিকিৎসা করা এবং বাড়িতে ডায়রিয়ার চিকিৎসা, খাওয়ার স্যালাইন প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান
- অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন কনডম, খাওয়ার বড়ি, ইত্যাদির সার্বক্ষণিক সরবরাহ ও বিতরণ
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিউনিটি ক্লিনিকে এসে আগ্রহী মহিলাদের কপার-টি স্থাপন এবং প্রথম ডোজ গর্ভরোধক ইনজেকশন প্রদান ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত জন্মনিরোধক ব্যবহারকারিণীকে চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান
- সাধারণ জখম, জ্বর, ব্যথা, কাটা-পোড়া, দংশন, বিষক্রিয়া, হাঁপানি, চর্মরোগ এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণ-ভিত্তিক ঔষধ প্রদান
- সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে জটিল স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে পাঠানো

কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

অত্যাবশ্যক সেবা প্যাকেজ প্রদান-ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপর্যন্ত যেভাবে সেবা প্রদান করা হয়েছে তাতেও জনগণের উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্টতা এবং অংশগ্রহণ রয়েছে, যেমন এলাকার লোকজনই ঠিক করেন কোন বাড়িতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক বা টিকাদান কেন্দ্র স্থাপিত হবে; জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বাড়ি বা আঙ্গিনা এসব অস্থায়ী কেন্দ্রের কাজের জন্য ব্যবহার করতে দেন। তবে বর্তমান কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ আরো সক্রিয় ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের স্থান নির্বাচন, নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (সারণী ২ দেখুন)। সরকার এককালীন অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে ক্লিনিকের যথাযথ পরিচালনা ও সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করবে। পক্ষান্তরে, সংশ্লিষ্ট জনগণকে ক্লিনিক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান এবং দৈনন্দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রয়োজনীয় মেরামত কাজসহ ক্লিনিকের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পাদন এবং নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। একইভাবে, ক্লিনিকগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সেবা প্রদানের

উদ্দেশ্যে সরকার যেমন তত্ত্বাবধানকারী জনবলের দ্বারা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো নিয়মিত পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন, তেমনি সংশ্লিষ্ট জনগণ তাদের এলাকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত 'কমিউনিটি গ্রুপের' মাধ্যমে ক্লিনিকগুলোর সার্বিক তদারকি নিশ্চিত করবেন। এভাবে, কমিউনিটি ক্লিনিক সরকার ও এলাকাবাসীর যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং এলাকাবাসীর প্রতিনিধিগণ এই যৌথ ব্যবস্থাপনায় অংশদারিত্ব করবেন। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক বিধায় এলাকার জনগণের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

সারণী ২

কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমে সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ ব্যবস্থাপনা

সরকারের দায়-দায়িত্ব

১. ন্যূনতম মান বজায় রেখে সুযোগ-সুবিধাসহ কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন নির্মাণ

২. কমিউনিটি ক্লিনিকের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সেবাপ্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান

৩. প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা

৪. কর্মীদের কাজের গুণগত মান পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান

জনগণের দায়-দায়িত্ব

১. ক্লিনিক নির্মাণের জন্য সরকারের অনুকূলে প্রয়োজনীয় জমি দান

২. ক্লিনিকের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় মেরামত ও নিরাপত্তা বিধান

৩. ক্লিনিক ভবনের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের ও সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ

৪. কর্মীদের কাজের সার্বিক দেখাশোনা ও সেবাদানে সহায়তা

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হলে এলাকাবাসীর কী সুবিধা হবে

◆ বর্তমান ব্যবস্থায় কর্মীরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সেবা দেওয়ার ফলে সেবার পরিধি বেশ ছোট। তাই চাহিদা বেশি থাকা সত্ত্বেও জনগণ কিছু নির্ধারিত সেবা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দু'জন কর্মী একত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাথমিক সেবা দেওয়ার ফলে সেবার পরিধি বাড়বে এবং সেবাগ্রহীতার জন্য একবার ক্লিনিকে এসে একসাথে দরকারী সব ধরনের সেবা নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

◆ বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সেবা দেওয়ার ফলে কর্মীদের পক্ষে অনেক সময় মান বজায় রেখে সেবা দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকবে এবং এখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মজুদ রাখা সম্ভব হবে। ফলে কর্মীদের পক্ষে মানসম্মত সেবা প্রদানের সুযোগ থাকবে।

◆ বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা নিজ নিজ কর্মসূচি অনুযায়ী আলাদা-আলাদাভাবে বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের ওপর অর্পিত কিছু নির্দিষ্ট সেবা দিয়ে থাকেন–যা সেবাগ্রহীতার সেই মূহুর্তের প্রয়োজনের উপযোগী না-ও হতে পারে। এতে কর্মীদের কাছ থেকে সেবা নেওয়ার জন্য বাড়ির সদস্যদের আলাদা-আলাদাভাবে অপেক্ষা করতে হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বিধায় সেবাগ্রহীতাগণ ক্লিনিক চলাকালে তাঁদের সুবিধামত যেকোনো সময়ে এসে সেবা ও পরামর্শ নিতে পারবেন। এতে সেবা নেওয়ার জন্য কর্মীদের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না।

◆ সরকার ও জনগণের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হওয়ায় এবং অংশীদারিত্বের ফলে এলাকাবাসীর ও সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ক্লিনিক ও সেবা-ব্যবস্থা সম্পর্কে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে। এতে স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং সেবা-ব্যবস্থা এলাকার জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে। আগামীতে এই ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকার জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যোগী হবেন।

উপসংহার

ইতোপূর্বে গ্রাম-পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে সেবা প্রদান ক'রে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হলেও শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। এছাড়া, বাড়ি-কেন্দ্রিক যে সেবা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অদক্ষ বলে প্রতীয়মান হয়। মাঠ-পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীদের কোনো কার্যালয় বা বসার স্থান না-থাকায় তাঁদের পক্ষে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। সর্বোপরি, জনসাধারণ এক জায়গা থেকে তাদের চাহিদা মাফিক সব সেবা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কমিউনিটি ক্লিনিক গ্রামীণ সেবা-ব্যবস্থায় এই অভাব পূরণে ও বর্তমান সীমাবদ্ধতা উত্তরণে সহায়ক হবে।

সেবাগ্রহীতা বা জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য সেবাপ্রদানকারীদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের সব প্রচেষ্টাই সেবা গ্রহণকারী বা এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য। তাদের উপকারের জন্য সেবাপ্রদানকারীগণ যদি আন্তরিকতার সাথে কমিউনিটি ক্লিনিককে ভিত্তি করে সেবাগ্রহণকারী বা গ্রামীণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী অত্যাবশ্যক সেবা-প্রদান ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারেন, তাহলে সেবার গুণগত মান এবং পরিধি বৃদ্ধি পাবে; সেবা-ব্যবস্থা সাশ্রয়ী হবে এবং সেবা-ব্যবস্থায় একটি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে। এই গুণগত উত্তরণই হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সংস্কার পরিকল্পনার চলমান লক্ষ্য। কমিউনিটি ক্লিনিক এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে।

এইডস-সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য ও বিশ্ব পরিস্থিতি

মোঃ তাজুল ইসলাম, হাসান আশরাফ, তাহমিনা বেগম

এইচআইভি ভাইরাসজনিত মারাত্মক ব্যাধি এইডস বর্তমানে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে একটি গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে এইডস-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশেও দেখা দিয়েছে, যদিও এদেশের সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। সাম্প্রতিক কালে UNAIDS-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ লোক এইডস রোগে আক্রান্ত।

প্রধানত দুই প্রকার ভাইরাস: এইচআইভি-১ এবং এইচআইভি-২ এইডস রোগের কারণ। সংক্রমণের পর এ-ভাইরাস অনেক বছর পর্যন্ত শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এসময় রক্তের বিশেষ কোষ (CD4, T helper cell) আস্তে-আস্তে ধ্বংস হতে থাকে এবং শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংক্রামিত ব্যক্তির শরীরে কোনো লক্ষণ থাকে না। নিজের অজান্তেই তার ভাইরাস অন্যকে সংক্রামিত করতে পারে। সংক্রামিত ব্যক্তি আজীবন এ-ভাইরাস শরীরে বহন করে। এখন পর্যন্ত এর প্রতিরোধক কোনো টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। এমন কোনো চিকিৎসাও নেই—যা দ্বারা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারে। তবে কিছু কিছু চিকিৎসা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে—যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসাধারণের পক্ষে এর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। এছাড়াও, এসব চিকিৎসার মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে—যা বহু রোগীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না।

এইডস কিভাবে ছড়ায় এবং ছড়ায় না

প্রধানত নিম্নোক্ত চারটি উপায়ে এইডস রোগের ভাইরাস একজন থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়াতে পারে:

যৌনসংগমের মাধ্যমে: এইচআইভি-সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে যৌনসংগমের মাধ্যমে এইডস রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে যৌনসংগম বলতে পুরুষের সাথে মহিলার, পুরুষের সাথে পুরুষের ও মহিলার সাথে মহিলার যৌনসংগমকে বুঝানো হয়েছে। যোনি-সংগম (যেক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ যোনিতে প্রবেশ করানো হয়), মুখ-সংগম (যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি বা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে পুরুষাঙ্গে বা যোনিতে মুখ ব্যবহার করা) কিংবা পায়ু-সংগম (পায়ুপথে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো)—এর যেকোনোটির মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রামিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এইচআইভি-সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে কেবল একবার যৌনসংগমের মাধ্যমেই এইচআইভি-তে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব।

সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত বা রক্তের উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে: এইচআইভি-সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত ও রক্তের উপাদান (যেমন প্লাজমা, প্লেটলেট বা রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান বা অঙ্গ-সংযোজন অথবা কাটা বা ক্ষতস্থানে সরাসরি সংক্রামিত রক্তের সংশ্রব দ্বারা এইচআইভি সংক্রামিত হতে পারে।

আক্রান্ত মা থেকে শিশুর দেহে সংক্রমণ: এইচআইভি-সংক্রামিত মা গর্ভাবস্থায়, শিশুর জন্মের সময় এবং স্তন্যদানের মাধ্যমে শিশুকে সংক্রামিত করতে পারে।

সংক্রামিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচের মাধ্যমে: শিরায় নেশাদ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তিরা সাধারণত একে অন্যের সুঁচ ব্যবহার করে। এইচআইভি-সংক্রামিত ব্যক্তির সুঁচ অন্য কেউ ব্যবহার করলে সে-ও আক্রান্ত হতে পারে। তেমনি ঘটনাক্রমে সুঁচের খোঁচা খেলে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেহে এর সংক্রমণ ঘটতে পারে। দন্তচিকিৎসায় বা শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও এইচআইভি'র সংক্রমণ সম্ভব।

এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা, যেমন স্পর্শ করা, আলিঙ্গন করা, সামাজিক চুম্বন, ইত্যাদির মাধ্যমে এইচআইভি'র সংক্রমণ ঘটে না। তেমনি, রোগীর সাথে একই টয়লেট ব্যবহার বা একই সাথে খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমেও এইচআইভি ছড়ায় না। এখন পর্যন্ত এমন কোনো নজির পাওয়া যায়নি যে, মশা, ছারপোকা বা এজাতীয় কোনো পোকার কামড়ে এইচআইভি'র সংক্রমণ ঘটেছে।

এইডস-সংক্রান্ত পরিস্থিতি

১৯৮১ সালে আমেরিকার লস এঞ্জেলসে কয়েকজন পুরুষ সমকামীদের মধ্যে প্রথম এইডস রোগ সনাক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে এশিয়ায় প্রথম এইডস রোগী সনাক্ত হয় থাইল্যাণ্ডে। ১৯৮৬ সালে ভারতে ও মায়ানমারে এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইডস রোগী সনাক্ত করা হয়।

UNAIDS-এর হিসাবমতে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ লোক এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও UNAIDS-এর অনুমান অনুযায়ী এইডস মহামারীর শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে—যা পৃথিবীর প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ থেকে ৪৯ বৎসর) জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ। এসব সংক্রামিত ব্যক্তির শতকরা ৯০ ভাগ বাস করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং এদের বেশিরভাগই (৯০%) জানে না যে, তারা এ-ভাইরাসে আক্রান্ত। কেবল ১৯৯৭ সালেই সারা বিশ্বে প্রায় ৫৮ লক্ষ লোক এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ১৬,০০০ জন। যদি এ-হারে এইচআইভি ছড়াতে থাকে, তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে এইচআইভি-আক্রান্ত লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪ কোটিরও বেশি।

আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের আশেপাশে এইচআইভি-তে আক্রান্ত এক বিরাট জনগোষ্ঠী বিদ্যমান (২ কোটি ৮ লক্ষ—যা প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ৭.৪ ভাগ)। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আগামী বছরগুলোতে নতুনভাবে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে আফ্রিকার চেয়ে এশিয়ায় অনেক বেশি হবে। মধ্য ও পূর্ব-আফ্রিকার কিছু শহরে মহিলা যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের ব্যাপকতা শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ এবং গর্ভকালীন সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ।

আঞ্চলিক পরিস্থিতি

ভারত

অনুমান করা হচ্ছে যে, ১৯৯৭ সালের শেষ নাগাদ ভারতে ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ লোক এইচআইভি-তে আক্রান্ত ছিলো—যা প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ। কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকার যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার শতকরা ১৪ ভাগ। ১৯৯৬ সনে মনিপুরে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারী পুরুষদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ৭৩ ভাগ। ১৯৮৯-১৯৯৩ সালে তামিল নাড়ুতে যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ১% থেকে ১০%, গর্ভকালীন সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ০.৩৭% থেকে ০.৭৬% এবং রক্ত প্রদানকারীদের মধ্যে ০.২৪% থেকে ০.৭২% বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালে মুম্বাইয়ের যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ৫০ ভাগ এবং দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভারদের মধ্যে তা ছিলো শতকরা ৩০ ভাগ। সুতরাং পরবর্তী দশকে প্রধানত ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে মহামারী আকারে এইডস দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

থাইল্যান্ড

১৯৯০ সালের শুরুতে থাইল্যান্ডে এইচআইভি-সংক্রামিত লোকের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৫০ হাজার। অতি দ্রুত থাই জনগণের মধ্যে এইচআইভি ছড়িয়ে

জেনে রাখা ভালো

ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ফ্লাভি ভাইরাস (Group B Arbo Virus) দ্বারা এ-রোগ হয়। এই ভাইরাস মানুষের শরীরে নিজে নিজে প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন একটি বাহন (Vector)। এডিস এজিপটি *(Aedis aegypti)* নামক একধরনের মশা এ-রোগের বাহক। ডেঙ্গু জ্বর প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ। সাধারণত শিশু-কিশোরেরাই এ-রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে বড়রাও আক্রান্ত হতে পারেন। এ-রোগ দু'ধরনের: সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর এবং হিমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর। সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর ৬-৭ দিন পর এমনিতে সেরে যায়, কিন্তু হিমোরেজিক জ্বরে রোগীর দারুণ ভোগান্তি হয়। রোগীর নাক-মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। এ-জ্বরে শতকরা ৫০ জন রোগী মারা যায়। বর্ষাকালে সাধারণত এ-রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। একবার এ-রোগ হলে যে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে, তা প্রায় ১ মাস স্থায়ী হয়। কয়েকবার এ-রোগ হলে স্থায়ী রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে।

এডিস এজিপটি নামের মশাটির বৈশিষ্ট্য হলো: একটি মশাই পরিবারের কয়েকজনের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বর ছড়াতে পারে এবং মশাটি যতদিন বাঁচে ততদিন পর্যন্ত রোগ ছড়াবার ক্ষমতা রাখে। এ-মশা অভিজাত এলাকায় বিভিন্ন পরিত্যাক্ত পাত্রে (যেমন ফুলের টব, টিনের কৌটা, ডাবের খোলা, ইত্যাদিতে) জমে–থাকা পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে এবং বংশ বিস্তার করে। যখন এডিস এজিপটি মশা কোনো ডেঙ্গু জ্বরের রোগীকে কামড় দেয়, তখন রোগীর দেহ থেকে চুষে-নেয়া রক্তের সঙ্গে এ-রোগের ভাইরাস মশার শরীরে প্রবেশ করে। এই ভাইরাস মশার দেহে প্রবেশের পর বৃদ্ধি পায় এবং ৮-১১ দিন পর রোগ বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করে। তখন ঐ মশা যদি কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ায় তবে মশার শরীর থেকে ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এরপর ৫-৮ দিন পর্যন্ত এই ভাইরাস মানুষের শরীরে মশা কামড়ানোর স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত লিফ গ্লান্ডের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং পরে রক্তের এবং লসিকার মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ ভীষণ শীত অনুভূত হয় ও প্রচন্ড জ্বর ওঠে এবং সমস্ত শরীর, মাথা, চোখ ও কোমরে প্রচন্ড ব্যথা হয়। শরীরের ব্যথা ভীষণ তীব্র হয় বলে আগের দিনে একে হাড়-ভাঙ্গা জ্বর (Break- bone fever) নামে অভিহিত করা হতো। এ-জ্বরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো: ৩-৫ দিন পর জ্বর ছেড়ে যায়, গায়ে লাল-লাল দানা বের হয়, কিন্তু ২ দিন পর পুনরায় জ্বর ওঠে এবং ৬-৭ দিন পর ভালো হয়ে যায়। এসময় কারো কারো শরীরের চামড়ায় রক্তক্ষরণের চিহ্ন দেখা যায় (Petaechial haemorrhage); আবার, কারো কারো নাক দিয়ে রক্তক্ষরণও হতে পারে।

হিমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের বেলায় রোগীর কষ্ট হয় অনেক বেশি। অনেক রক্তক্ষরণ হয়। ২-৩ দিন পরই রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। রোগী শক-এ আক্রান্ত হয়–অর্থাৎ নাড়ী খুব দ্রুত ও মৃদু অনুভূত হয়; হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়; শরীর ঘেমে গিয়ে ভিজা-ভিজা লাগে। রক্তচাপ খুব কম হয় বা মাপা সম্ভব হয় না; রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। এ-রোগের নিরাময়কারী কোনো ঔষধ বা প্রতিষেধক নেই সত্যি, কিন্তু উপসর্গ অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসা (Supportive treatment) দিয়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। চিকিৎসাও বেশ ব্যয়বহুল। অথচ আমরা স্বাস্থ্যসচেতন হয়ে যদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে এ-রোগ দমন করা সম্ভব।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করতে হলে যা যা করবেন

- অবশ্যই মশারীর ভিতরে পরিবারের সবাই ঘুমানোর ব্যবস্থা করবেন এবং পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনকেও এ-বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।
- ডেঙ্গু জ্বরের রোগীকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মশারীর ভিতরে রাখবেন।
- বাড়ির আশ-পাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন এবং কোথাও পানি জমে থাকতে দেবেন না, যেখানে মশা বংশ বিস্তার করতে পারে।
- মশক নিধনের জন্য বাড়ির ভিতরে এবং আশে-পাশে কীটনাশক ছিটাতে হবে।
- ডেঙ্গু জ্বর-উপদ্রুত এলাকা থেকে আপনার বাসায় কোনো মেহমান এলে তাঁকে ৭ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে–তার জ্বর ওঠে কি না; জ্বর উঠলে তা ডেঙ্গু কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। মেহমানকে অবশ্যই মশারীর ভিতরে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ডেঙ্গু জ্বর সন্দেহ হলে অবহেলা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

ডাঃ এম মতিউর রহমান
স্টাফ ক্লিনিক, আইসিডিডিআর,বি

পড়েছে। ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি থাই সেনাবাহিনীর লোকদের শতকরা ৪ ভাগ এবং শহরের গর্ভকালীন সেবাগ্রহীতাদের শতকরা ১.৪ ভাগ ছিলো এইচআইভি দ্বারা সংক্রামিত। ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে সংক্রমণের হার ছিলো শতকরা ৪০ ভাগ। বর্তমানে থাইল্যান্ডে সংক্রামিত লোকের সংখ্যা আনুমানিক ৭৫,০০০–যা মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ২.৩ ভাগ।

মায়ানমার

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে মায়ানমারে যৌনকর্মীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার শতকরা ৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ ভাগে উন্নীত হয়: গর্ভকালীন সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ২ ভাগ, আর নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ। অনুমান করা হয়, ১৯৯৬ সালে চীনে এইচআইভি-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিলো ২ লক্ষ। কারো কারো মতে ১৯৯৭ সালের শেষে উক্ত সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। কম্বোডিয়ার প্রতি ২০ জনের ১ জন গর্ভবতী মহিলা, শতকরা ৬.৩ জন সৈন্য ও পুলিশের লোক এবং শতকরা ৫০ ভাগ যৌনকর্মী এইচআইভি-তে আক্রান্ত।

এশিয়ায় ও উপসাগরীয় এলাকায় এইচআইভি-আক্রান্ত ৬৪ লক্ষ লোক বিদ্যমান–যা পৃথিবীর মোট এইচআইভি-আক্রান্ত জনসংখ্যার ৫ ভাগের ১ ভাগ। ধারণা করা হচ্ছে, ২০০০ সালের শেষদিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪ ভাগের এক ভাগ হবে।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের সঠিক তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে এপর্যন্ত ১০৩ জন আক্রান্ত লোকের খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই ৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিলেটে এইচআইভি/এইডস-এর সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। অনুমান করা হচ্ছে, ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ লোক এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত হবে এবং প্রায় ৪,০০০ লোক এ-রোগে মৃত্যুবরণ করবে। সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে শিরায় নেশাদ্রব্য গ্রহণকারী ও পতিতালয়ে অবস্থানকারী পতিতাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার যথাক্রমে শতকরা ২.৫ ও ০.৬ ভাগ। বাংলাদেশে–যেখানে বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাব অনেক বেশি–এইচআইভি/এইডস-এর মত ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সর্বনাশ ডেকে আনবে। সংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব যদি জনগণ জানে কিভাবে তা প্রতিরোধ করতে হয় এবং সে মোতাবেক আচরণ করে।

বাংলাদেশে দ্রুত এইডস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ

ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশে নিম্নোক্ত কারণে এইচআইভি/এইডস দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে:

- প্রতিবেশী দেশ, যেমন ভারত, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি।
- বাংলাদেশে আনুমানিক প্রায় ১ লক্ষ পতিতা রয়েছে এবং এরা প্রত্যেকে গড়ে প্রতিদিন ৩ জন গ্রাহকের সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়। কলকাতার নিষিদ্ধ এলাকার পতিতাদের শতকরা ১২ জন বাংলাদেশী এবং এরা প্রায়ই তাদের নিজ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে এবং এ-দেশেও যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। বর্তমানে কলকাতার পতিতাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার শতকরা ১৪ ভাগ।
- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিবাহপূর্ব অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যৌনসম্পর্ক ব্যাপকভাবে বিদ্যমান—যার আনুমানিক হার শতকরা ৫০ ভাগ। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যৌনসম্পর্কের হার দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভারদের মধ্যে সর্বোচ্চ (৬০%)। তারা যৌনসঙ্গী হিসেবে পতিতাদের ব্যবহার করে। অন্য এক জরিপে দেখা গেছে, সাধারণ মানুষ ও পতিতাদের মধ্যে যৌনব্যাধি সংক্রমণের হার যথাক্রমে ১-২% এবং ৯০%।
- বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ ব্যাগ রক্ত অন্যের দেহে সঞ্চালনের জন্য সংগ্রহ করা হয়—যার বেশিরভাগই এইচআইভি'র জন্য পরীক্ষা করা হয় না। অন্য জরিপে দেখা গেছে, ১০-২০% পেশাদার রক্ত প্রদানকারীদের রক্তে সিফিলিস রোগের এন্টিবডি বিদ্যমান।
- বাংলাদেশে শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাদ্রব্য গ্রহণকারী বিদ্যমান, যদিও এদের সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই। যদি কখনো এদের কেউ এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়, তবে তা দ্রুত একই সিরিঞ্জ ব্যবহারকারী অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।
- প্রতিবছর প্রায় ৭৪,০০০ বাংলাদেশী কর্মসংস্থান বা ব্যবসার কারণে বিদেশে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই থাইল্যান্ড ও ভারতে যায়, যেখানে ইতোমধ্যেই এইচআইভি সংক্রমণের হার অনেক বেশি। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কারণে সেখান থেকে কেউ কেউ সংক্রামিত হতে পারে।
- বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ বিদেশী লোক আসেন এবং তাদের অনেকেই যৌনসঙ্গী হিসেবে পতিতাদের ব্যবহার করেন।
- জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে কনডমের ব্যবহার খুব কম। পতিতাদের ক্ষেত্রে এর হার অত্যন্ত নগণ্য।

ভারতের মুম্বাই শহরে
১৯৮৬-১৯৯৬ সালে এইডস পরিস্থিতির রেখচিত্র

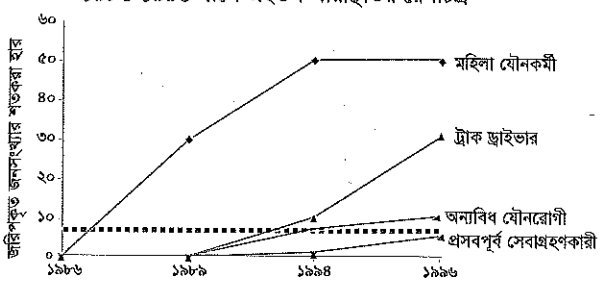

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের মুম্বাই শহরের বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের রেখচিত্র

প্রতিরোধের উপায়

- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহারের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব। যৌনকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা সম্ভব না হলে কেবলমাত্র একজন বিশ্বস্ত এইচআইভিমুক্ত যৌনসঙ্গী রাখা অথবা নিরাপদ যৌনসংগম করা—অর্থাৎ সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করে যৌনসংগম করা
- যৌনরোগ থাকলে দ্রুত এর চিকিৎসা করা
- এইচআইভি পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা
- শিরায় নেশাদ্রব্য গ্রহণকারীদের একে অপরের সিরিঞ্জ ব্যবহার না-করা এবং ইনজেকশনের জন্য অপরিশোধিত সিরিঞ্জ ব্যবহার না-করা; এক সিরিঞ্জ একবারের জন্য ব্যবহার করাই উত্তম
- শল্যচিকিৎসা ও দন্তচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করার পর ব্যবহার করা
- এইচআইভি-সংক্রামিত মহিলাদের গর্ভধারণ না-করা; তবে যদি কেউ গর্ভধারণ করতে চায়, তাহলে তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার জন্য তাকে এইচআইভি-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া
- স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা

এইচআইভি-এর উপযুক্ত নিরাময়মূলক কোনো চিকিৎসা বা প্রতিরোধক টিকা নেই। অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনাও কম। তাই এইচআইভি'র বিস্তার রোধ করাই হচ্ছে একমাত্র পদক্ষেপ। আমাদের উচিৎ প্রতিরোধমূলক তথ্য সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রচার করা। যদি এইচআইভি'র সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের লোক সচেতন হয় এবং তা কঠোরভাবে অনুসরণ করে, তাহলেই কেবল এইচআইভি'র বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

(চলবে)

শিশুদের নিউমোনিয়া

(৮-এর পাতার পর)

দুই মাসের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে → কাশি বা শ্বাসকষ্ট + দ্রুতশ্বাস = মারাত্মক নিউমোনিয়া

দুই মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে → কাশি বা শ্বাসকষ্ট + দ্রুতশ্বাস = সাধারণ নিউমোনিয়া

কখন বুঝবেন শিশু মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত

শিশুর কাশি এবং দ্রুতশ্বাসের সাথে সাথে যদি বুকের খাঁচার নিচের অংশ ভিতরের দিকে ডেবে বা চেপে যায় (Chest indrawing), তাহলে আমরা বুঝবো শিশুটি মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। এখানে বয়স কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়—অর্থাৎ যেকোনো বয়সের ক্ষেত্রে:

কাশি + দ্রুতশ্বাস + বুকের নিচের অংশ ডেবে-যাওয়া = মারাত্মক নিউমোনিয়া

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মারাত্মক নিউমোনিয়ায় শিশুর দ্রুতশ্বাস এবং বুক ডেবে-যাওয়া লক্ষণীয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুর বুকের নিচের অংশ ঠিকই ডেবে যায়, কিন্তু বয়স অনুযায়ী শ্বাসের গতি ততটা বেশি নয়—অর্থাৎ দ্রুতশ্বাস অনুপস্থিত। অনেক সময় মারাত্মক নিউমোনিয়ার চিকিৎসা সময়মত না করলে অসুস্থতার শেষের দিকে শিশুর শ্বাসের গতি কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। তাই দ্রুতশ্বাস যেমন নিউমোনিয়ার বা সাধারণ নিউমোনিয়ার একমাত্র লক্ষণ, তেমনি বুকের নিচের অংশ ডেবে-যাওয়া মারাত্মক নিউমোনিয়ার একমাত্র লক্ষণ।

কখন বুঝবেন শিশু খুবই মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত

শিশুর কাশি, দ্রুতশ্বাস এবং বুক ডেবে-যাওয়া ছাড়াও যদি নিম্নোক্ত বিপদচিহ্ন দেখা যায়, তাহলে আমরা বুঝবো শিশুটি খুবই মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত:

- বুকের দুধ বা পানীয় মোটেই গ্রহণ না-করা
- শ্বাসকষ্টের সাথে সাথে শরীর, মুখমন্ডল নীল হয়ে-যাওয়া
- খিঁচুনি হওয়া
- অতিরিক্ত ঘুম-ঘুম ভাব
- শ্বাস নেওয়ার সময় বাধাগ্রস্ত শব্দ-হওয়া
- মারাত্মক পুষ্টিহীনতা

কাশি, দ্রুতশ্বাস এবং বুক ডেবে-যাওয়া, ইত্যাদির সাথে উপরোল্লিখিত এক বা একাধিক বিপদচিহ্ন থাকলেই আমরা বুঝবো শিশুটি খুবই মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত।

শিশুর সর্দি ও কাশির সাথে যদি দ্রুতশ্বাস, বুক ডেবে-যাওয়া এবং অন্য কোনো বিপদচিহ্ন না থাকে তখন আমরা বুঝবো শিশুটির নিউমোনিয়া হয়নি এবং শিশুর এধরনের অসুস্থতাকে আমরা বলি 'সাধারণ সর্দি-কাশি'। সাধারণ সর্দি-কাশিতে শিশুর মধ্যে নিচের লক্ষণগুলো অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়:

- নাক দিয়ে পানি পড়বে।
- কাশি থাকবে এবং কাশির শেষের দিকে কিছুটা বমিও হতে পারে।
- অল্প-অল্প জ্বর থাকবে। সাধারণত শিশুর সর্দি যতদিন থাকে, জ্বরও ততদিন দীর্ঘায়িত হতে পারে।
- চোখ কিছুটা লালচে হতে পারে এবং অল্প পানিও ঝরতে পারে।
- সর্দিতে নাক বন্ধ থাকায় শিশুদের দুধ খেতে অসুবিধা হয়, তাই এ-অবস্থায় শিশু একটু অস্থির হয় এবং কান্নাকাটি করে।

কাশিতে আক্রান্ত শিশুকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং যথাযথ রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রতিকার

কোনো শিশু 'মারাত্মক' এবং 'খুবই মারাত্মক' নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে দ্রুত শিশুটিকে নিকটস্থ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা জেলা-পর্যায়ের হাসপাতালে নিতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে শিশুর সুস্থতার জন্য অক্সিজেন, এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন, সতর্কতার সঙ্গে বুকের দুধ বা পানীয় খাওয়ানো, ইত্যাদি পদক্ষেপ অতীব জরুরী হয়ে পড়ে। একটি বিষয় পরিষ্কার যে, দুই মাসের কম বয়সের শিশুদের নিউমোনিয়া মানেই মারাত্মক নিউমোনিয়া। কাজেই এ-বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে সত্বর নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে।

সাধারণ নিউমোনিয়াতে করণীয়

শিশুর যদি 'সাধারণ নিউমোনিয়া' হয়, তাহলে কোট্রাইমক্সাজল বড়ি দিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসা করা যায়। সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীগণ বাড়িতে এই সেবা প্রদান করে থাকেন। বাংলাদেশ সরকার শিশুদের নিউমোনিয়া-সংক্রান্ত সেবাদান প্রকল্পের জন্য শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কোট্রাইমক্সাজল বড়ি সরবরাহ করে থাকে। বাজারে প্রচলিত যে কোট্রাইমক্সাজল বড়ি পাওয়া যায়, তার ১টি বড়ি শিশুদের জন্য নির্মিত ৪টি কোট্রাইমক্সাজল বড়ির সমান। কাজেই সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত বড়ি না পেলেও বাজারে প্রচলিত বড়িটিকে সমান ৪ ভাগ করে তার একটি অংশ শিশুকে একমাত্রা হিসেবে খাওয়ানো যায়। নিচের ছকে ওষুধের মাত্রা দেখানো হলো:

শিশুদের জন্য তৈরি বড়ির সংখ্যা	কতবার খাওয়াতে হবে	কতদিন খাওয়াতে হবে
২ মাস - ১ বছর, ২টি	দিনে ২ বার, সকাল ও সন্ধ্যায়	৫ দিন
১ বছর - ৫ বছর, ৩টি	দিনে ২ বার, সকাল ও সন্ধ্যায়	৫ দিন

যদি শিশুর জ্বর থাকে অর্থাৎ তাপমাত্রা ৩৮° সেঃ-এর বেশি থাকে, তাহলে প্যারাসিটামল সিরাপ দিয়ে শিশুর জ্বরের চিকিৎসাও একসঙ্গে করতে হবে।

২ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুকে ১ চামচ করে ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর না কমে ততক্ষণ খাওয়াতে হবে।

৩ বছর থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুকে ২ চামচ করে ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর না কমে ততক্ষণ খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসা চলার সময় শিশুর শারীরিক পরিচর্যা বিষয়ে মাকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ খেতে দিতে হবে; নাক সর্দিতে বন্ধ থাকলে তুলা দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং শিশুকে উষ্ণ পরিবেশে

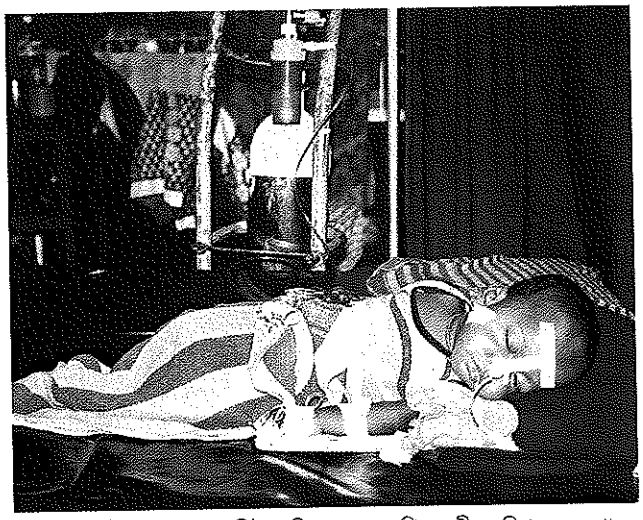

সময়মত চিকিৎসা না পেলে নিউমোনিয়া-আক্রান্ত শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে

রাখতে হবে। কোট্রাইমক্সাজল বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করার সময় যদি শিশুর অবস্থার উন্নতি হয়, তাহলে ৫ দিন পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ৪৮ ঘন্টার মধ্যেও যদি কোনো উন্নতি না দেখা দেয় – অর্থাৎ শিশুর অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে অথবা রোগ আরো বেড়ে যায়, তবে বাড়িতে না রেখে শিশুকে শীঘ্র নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে।

শিশুর সাধারণ সর্দি-কাশিতে করণীয়

শিশুর সাধারণ সর্দি-কাশি হলে কোনো এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো বাড়িতে শিশুর সেবা-যত্ন করা। এক্ষেত্রে যা যা করণীয় তা হলো:

- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। অসুস্থতা চলাকালে শিশুর অরুচি থাকে। তাই অল্প-অল্প করে বার-বার বুকের দুধ খেতে দিতে হবে। অসুস্থতার পরপর শিশুকে বেশি-বেশি করে বুকের দুধ এবং অন্যান্য পানীয় খেতে দিতে হবে। এতে শিশু তার হারানো ওজন ফিরে পাবে।
- শিশুর নাক বন্ধ থাকলে দুধ টেনে খেতে কষ্ট হয়। তাই বন্ধ নাক পরিষ্কার করে দিতে হবে। তুলা দিয়ে নাক মুছে দিতে হবে। শিশুর নাকে যদি সর্দি শুকিয়ে থাকে, তাহলে দুই ফোঁটা লবণাক্ত পানি ব্যবহার করলে উপকার হতে পারে। বাজারে প্রচলিত নাকের ড্রপ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- কাশির জন্য বাজারে প্রচলিত কোনো সিরাপ শিশুকে খাওয়ানো ঠিক নয়। এতে শিশুর ঘুম-ঘুম ভাব বেড়ে যায় এবং শিশুর খাদ্যাভ্যাসে প্রভাব পড়ে—অর্থাৎ শিশুর খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। অনেকে শিশুর একটু কাশি থাকলেই এন্টিবায়োটিক সিরাপ খাওয়াতে শুরু করেন। এটি আদৌ ঠিক নয়। শিশুর কাশি থাকলে কোনো সিরাপ না-খাইয়ে একটু গরম দুধ, তুলসী পাতার রস এবং মধু মিশিয়ে অল্প-অল্প করে খাওয়ানো যায়। এতে শিশুর কাশির তীব্রতা কমে যায়।
- শিশুর জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ানো যেতে পারে। শরীর পানি দিয়ে মুছে দেওয়া এবং মাথায় ঠাণ্ডা পানি দেওয়া উচিৎ নয়। এটা শিশুর জন্য আরামদায়ক নয়, বরং তার কাছে বিরক্তিকর।
- শিশুকে উষ্ণ পরিবেশে রাখতে হবে। শিশুর গায়ে অতিরিক্ত কাপড় জড়িয়ে রাখা ঠিক নয়। এটাও শিশুর কাছে বিরক্তিকর।

সাধারণ সর্দি-কাশির জন্য শিশুকে বাড়িতে পরিচর্যা করার সময়ও মাকে খেয়াল রাখতে হবে: দ্রুতশ্বাস কিংবা বুক ডেবে-যাওয়া দেখা দেয় কি না। যদি দেখা দেয়, তবে আর বাড়িতে পরিচর্যা নয়, নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে বা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করতে হবে।

আসুন, আমরা সবাই শিশুর যথাযথ যত্ন নিই এবং রোগমুক্ত শিশু তথা রোগমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

শিশুদের নিউমোনিয়া ও সাধারণ সর্দি-কাশি

রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার

চন্দ্রশেখর দাস

নিউমোনিয়া শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু শুধুমাত্র নিউমোনিয়াতেই মারা যায়। আর ডায়রিয়াজনিত কারণে মারা যায় প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার শিশু। কাজেই নিউমোনিয়াই হলো শিশুদের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি। ছোট শিশুদের, বিশেষত দুই বছরের কম বয়সের শিশুদের নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কোনোপ্রকার ডাক্তারী যন্ত্রপাতি (যেমন স্টেথিস্কোপ) ছাড়াই শুধুমাত্র মায়ের সাথে কথা বলে এবং শিশুর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

ফুসফুসের সংক্রমণকেই নিউমোনিয়া বলা হয়। এই সংক্রমণ সাধারণত ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইরাসজনিত নিউমোনিয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়া থেকে অনেক বেশি লক্ষণীয়। শিশু যখন নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়, তখন তার মধ্যে কিছু প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। লক্ষণগুলো হলো: কাশি, জ্বর, দ্রুতশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্বর থাকতে পারে; আবার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে না-ও থাকতে পারে। জ্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মায়েরা সাধারণত বলেন, বাচ্চার অল্প-অল্প জ্বর হয়। কাজেই জ্বর নিউমোনিয়ার প্রধান লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য নয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের দ্রুতশ্বাস বা শ্বাসটান হলে সেটা সহজেই মায়েদের চোখে পড়ে। যদি কোনো শিশুর কাশি থাকে এবং তার সঙ্গে থাকে দ্রুতশ্বাস, তাহলে সেই শিশুর নিউমোনিয়া হয়েছে কি না তা নির্ণয় করার জন্য সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে। প্রতিমিনিটে শিশুর কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে, তার জন্য হাতঘড়ি বা মিনিট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক অবস্থায় (অস্থির নয় বা কান্নাকাটি করছে না) পূর্ণ এক মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি গণনা করতে হবে। শিশুর শ্বাস নেওয়ার সময় বুক এবং পেট একসঙ্গে ফুলে ওঠে এবং শ্বাস ছাড়ার সময় একসঙ্গে নেমে যায়। গণনার সময় একবার ফুলে-ওঠা এবং নেমে-যাওয়াকে একত্রে একটি (১) শ্বাস-প্রশ্বাস হিসেবে গণ্য করা হবে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এক রকম নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে কোন বয়সের শিশুর মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হলে সেটা নিউমোনিয়া হিসেবে গণ্য হবে, তা নিচের ছকে দেখানো হলো:

বয়স	নিউমোনিয়াজনিত শ্বাস-প্রশ্বাস
২ মাসের কম	মিনিটে ৬০ বার বা তার বেশি
২ মাস - ১২ মাস	মিনিটে ৫০ বার বা তার বেশি
১২ মাস - ৫ বছর	মিনিটে ৪০ বার বা তার বেশি

নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে আমরা নিউমোনিয়া সনাক্ত করতে পারি:

কাশি বা শ্বাসকষ্ট + দ্রুতশ্বাস = নিউমোনিয়া

দুই মাসের বেশি বয়সের যেকোনো শিশুর কাশির সঙ্গে দ্রুতশ্বাস থাকলে আমরা সেটাকে 'সাধারণ নিউমোনিয়া' বলি। কিন্তু দুই মাসের কম বয়সের শিশুদের কাশির সাথে দ্রুতশ্বাস (মিনিটে ৬০ বা তার বেশি) থাকলে আমরা সেটাকে 'মারাত্মক নিউমোনিয়া' হিসেবে চিহ্নিত করবো। কারণ, দুই মাসের কম বয়সের শিশুদের নিউমোনিয়া হলে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। কাজেই এই বয়সের নিউমোনিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সাধারণ নিউমোনিয়া না বলে 'মারাত্মক নিউমোনিয়া' বলা হয়েছে।

(৬ এর পাতায়)

স্বাস্থ্য কুইজ ২৬

১. প্রসূতি মাকে প্রসবের কতদিনের মধ্যে ভিটামিন-এ খাওয়ানো প্রয়োজন ?

২. কোনো শিশু যদি তার জন্মের ১০ মাসের মধ্যে কোনো EPI টিকা না পেয়ে থাকে, তবে তার শারীরিক কষ্টকে সীমিত রেখে EPI টিকা প্রদানের ডোজসমূহ কী এবং কত বয়স পর্যন্ত দেওয়া যায়?

৩. গর্ভবতী মায়ের সিফিলিস থাকলে তার গর্ভস্থ শিশুর কী কী অসুবিধা হতে পারে?

৪. সিফিলিস নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন কেন?

৫. যে প্রসূতি মা তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান এবং সেই মা যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খেতে চান, তবে তাকে কোন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি দেওয়া যাবে?

স্বাস্থ্য কুইজ ২৫-এর উত্তর

১. এইচআইভি অর্থাৎ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস হচ্ছে এইডস রোগের ভাইরাসের নাম। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর ১ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যে যে রোগ দেখা দেয় তাকে এইডস বলে।

২. নিম্নলিখিত চার উপায়ে এইচআইভি এবং এইডস ছড়ায়:
   ক. অবাধ যৌনমিলনের মাধ্যমে
   খ. এইচআইভি/এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য অন্যের দেহে সঞ্চালনের মাধ্যমে
   গ. শিরায় এইচআইভি/এইডস-আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ ব্যবহার করলে
   ঘ. এইচআইভি/এইডস-আক্রান্ত মায়ের গর্ভজাত সন্তান জন্মসূত্রে এইডস-আক্রান্ত হয়ে থাকে

৩. বাংলাদেশে শ্বাসতন্ত্রের তীব্র প্রদাহ (এআরআই)-এর গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ:
   ক. RSV অর্থাৎ রেসপিরেটরি সিনসাইটায়াল ভাইরাস
   খ. *Streptococcus pneumoniae* অর্থাৎ নিউমোকক্কাই
   গ. *Haemophilus influenzae* অর্থাৎ হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জী

৪. সাধারণত জীবাণুসৃষ্ট কোনো ডায়রিয়া হঠাৎ শুরু হয়ে যদি ১৪ দিন বা তার বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, তবে তাকে দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া বলে। ১৪ দিনের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ৪৮ ঘণ্টা বা তার কম সময় ডায়রিয়ামুক্ত থাকে, সেটাও দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৫. দুই মাসের কম বয়সের শিশুদের শ্বাসের গতি প্রতিমিনিটে ৬০ বা তার অধিক হলে তাকে মারাত্মক নিউমোনিয়া বলে। দুই মাস থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের শ্বাস নেওয়ার সময় যদি বুকের খাঁচার নিচের অংশ ভিতরে ডেবে যায় *(Chest indrawing)*, তখন তাকে মারাত্মক নিউমোনিয়া বলে। তবে শিশুর এই অবস্থার সাথে বয়সভেদে দ্রুতশ্বাস *(Fast breathing)* থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যদি কোনো শিশুর বয়সভেদে প্রতিমিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নিম্নরূপ হয়, তবে তাকে মারাত্মক নিউমোনিয়া বলা হয়:
   ক. ০-২ মাস বয়স পর্যন্ত: ≥৬০
   খ. ২ মাস-১ বৎসর বয়স পর্যন্ত: ≥৫০
   গ. ১ বৎসরের উর্দ্ধে: ≥৪০

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা: অধ্যাপক ডেভিড এ. স্যাক; প্রধান সম্পাদক: ডা: ফকির আঞ্জুমান আরা; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: এম. শামসুল ইসলাম খান; সম্পাদক: এম.এ. রহীম
সদস্য: ইউসুফ হাসান, ডা: হাফিজুর রহমান চৌধুরী, ডা: হাসান আশরাফ, ডা: দিলারা ইসলাম ও ডা: কামরুন নাহার; ডিজাইন: আসেম আনসারী
প্রকাশক : আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ, মহাখালী, ঢাকা ১২১২ (জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮২২৪৬৭, ৮৮১১৭৫১-৬০; ফ্যাক্স: ৮৮০২-৮৮২৩১১৬ ও ৮৮২৬০৫০; ই-মেইল: disc@icddrb.org

মুদ্রণে ঃ ব্র্যাক প্রিন্টার্স বাংলাদেশ